দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত থেকে শুরু করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও বিভিন্ন পদমর্যাদার অসংখ্য কর্মকতা-কর্মচারী পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন

ইমাদুল হক প্রিন্স

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সন্দেহাতীতভাবে সর্বাগ্রে। এখানকার অকুতোভয় ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। প্রাণপণে রুখেছেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে। জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন অকাতরে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত থেকে শুরু করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও বিভিন্ন পদমর্যাদার অসংখ্য কর্মকতা-কর্মচারীরা পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। এদের মধ্যে যাদের নাম পরিচয় পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে শিক্ষক রয়েছেন ১৯ জন, ছাত্র ১০১ জন; কর্মকর্তা একজন ও কর্মচারী ২৮ জন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক শহীদ হলে সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমে আসে মৃত্যুর হিমশীতল নীরবতা। এ দুর্দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এগিয়ে আসেন। যেসব শিক্ষক তাদের মনোবল না হারিয়ে শহীদ পরিবারের জন্য এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম- অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহম্মেদ, মোঃ আবুল খায়ের, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ফজলুর রহমান খান প্রমুখ। অসহায় ও বিপন্ন পরিবারের জন্য অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ সরবরাহ ও সংগ্রহের কাজে তারা নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। যুদ্ধের সময় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য আশ্রয় নেন পুরান ঢাকায়। কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নির্দেশে ২১ এপ্রিল ১৯৭১ তিনি পুনরায় যোগদান করতে বাধ্য হন। তারপর তিনি তার পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইশা খাঁ রোডের ৩১ নং বাসায় চলে আসেন। এ সময় বাধ্যতামূলকভাবে তিনি পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন। রাস্তাঘাটে চলতে মাঝে-মধ্যেই সেনাবাহিনীকে দেখাতে হতো এ পরিচয়পত্র। পরিচয়পত্রে লেখা থাকত পরিচয়পত্রধারী পাকিস্তানের অনুগত নাগরিক। কিন্তু এসব করেও শহীদ ভট্টাচার্যসহ অনেক শিক্ষকের শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় একদল রাজাকার-আল বদর বাহিনী অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে টেনেহিঁচড়ে বাসার ওপর থেকে নিচে নামিয়ে আনেন। নিচে নেমে অপেক্ষমাণ গাড়িতে চোখ বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন ও আবুল খায়েরকে। অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্রকেও চোখ বেঁধে গাড়িতে ওঠানো হয়। এরপরের ঘটনা সবারই অজানা। শোনা যায়, নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে ১৪ ডিসেম্বর বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাদেরও হত্যা করা হয়। (সূত্র : ইতিহাস বিভাগ ঢা. বি.)

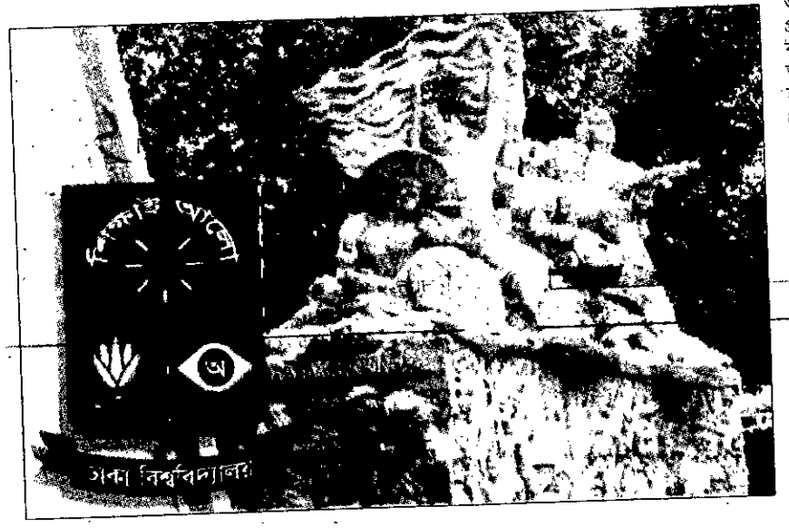

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্য

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেজন্য এ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পাক-হানাদার বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য। ছাত্রদের ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় গণহত্যা চালানো হয়। গোটা নয় মাস জুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হুমকির মুখে। মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মোঃ হারুন অর রশিদ বলেন, 'হানাদারবাহিনীর প্রকৃতি দেখে স্বাভাবিকভাবে যা দেখা যায় তা হলো তাদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম রাতে (২৫ মার্চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তারা হত্যা করে। এরপরেও তারা অনেককে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু ব্যর্থ হয়। তারা প্রথমে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ইকবাল হল (সূর্য সেন হল) ও জগন্নাথ হলে আক্রমণ চালায় এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে হত্যা করে। তারা কলা ভবনের সামনের বটগাছটি উপড়ে ফেলে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা আঁচ করতে পেরে যদি ছাত্র-শিক্ষকরা সরে না যেত, তবে আরও অনেকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হতো।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের মূল ফটকের সামনে যে সবুজ চত্বরটি রয়েছে, তার একেবারে মূল রাস্তার দিকের অংশে রয়েছে শহীদ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের একটি নামফলক। মধুর ক্যান্টিনের সামনেই রয়েছে মধুদার স্মৃতি ভাস্কর্য। উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অর্থাৎ ফুলার রোডের সংযোগস্থলে রয়েছে শহীদ স্মৃতিসৌধ বেদি। মধুর ক্যান্টিনের একটু পূর্বদিকে রয়েছে কালো টিনের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা শহীদদের নামফলক। জগন্নাথ হলের মন্দিরের কিছু দূরেই আছে শহীদদের নামফলক। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের গেটে আছে একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। এসব স্মৃতিস্তম্ভ ও নামফলক চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকবে। আর বাঙালী জাতি এদের স্মরণ করবে চিরকাল। শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান। শুধু তাই নয়, শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে গঠন করা হয়েছে শহীদ গিয়াসউদ্দীনের নামে একটি ট্রাস্ট ও ১টি শহীদ স্মৃতি পাঠাগার, গবেষণাগার, বিভিন্ন স্মারক বৃত্তি ইত্যাদি।